



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 143 - 150

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ইকোট্রিসিজমের তত্ত্বের আলোকে কিন্নর রায়ের উপন্যাস

ড. চন্দনা চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ নাকাশিপাড়া, মুড়াগাছা

Email ID : chandanachakraborty1000@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

ইকোট্রিসিজম,
কিন্নর রায়,
প্রকৃতি বন্দনা,
পরিবেশের বিপন্নতা,
ইকোলজিক্যাল
ব্যালেন্স, পরিযায়ী
পাখি, নদীর শুষ্কতা।

Abstract

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ রক্ষার জন্য যে লাগাতার প্রচেষ্টা চলছে এবং মাত্রাতিরিক্ত দূষণের ফলে একে একে ধেয়ে আসছে মহামারী অতিমারী, বিশ্বউষ্ণায়ন, দাবানল, ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ। মানব সমাজ আজ গভীর সংকটের মুখে। পরিবেশের বিপন্নতা থেকেই জন্ম নিয়েছে পরিবেশবাদ। মানুষ তাঁর সভ্যতাকে বিকশিত করতে, জীবন যাপনে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে, অর্থনৈতিক ভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে প্রাকৃতিক সম্পদকে নির্বিচারে ব্যবহার করেছে। ফলে বেড়েছে পরিবেশ দূষণ। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে যখন সর্বত্র চলছে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই, তখন সেই নির্মল পরিবেশ বনাম দূষণের লড়াইতে লেখনীকে অস্ত্র বানিয়ে সামিল হয়েছেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যিক কিন্নর রায়। তাঁর ‘প্রকৃতিপাঠ’, ‘বিশ্বকুস্ত’, ‘মৃত্যুকুসুম’, ‘ধূলিচন্দন’ ইত্যাদি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কবলে পড়ার কথা।

Discussion

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্র ও ভারতীয় জীবনসাধনা উভয় ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে বাংলা সাহিত্যে পরিবেশ চেতনা আত্মবিকাশ লাভ করে। জন্মলাভ করে পরিবেশ কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা বা Eco criticism। যে তত্ত্বে ব্যঞ্জিত হয় - মানুষ ও প্রকৃতির সুনিয়ন্ত্রিত মিথস্ক্রিয়ায় সচল থাকে পৃথিবীর প্রাণপ্রবাহ।

“জগতের উপর মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপর বিশ্বমনের কারখানা সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।”^১

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ রক্ষার জন্য যে লাগাতার প্রচেষ্টা চলছে এবং মাত্রাতিরিক্ত দূষণের ফলে একে একে ধেয়ে আসছে মহামারী অতিমারী, বিশ্বউষ্ণায়ন, দাবানল, ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ। মানব সমাজ আজ গভীর সংকটের মুখে। সেই বিপন্ন পৃথিবীতে সমাজ ও মানব জীবনের দর্পণ সাহিত্য কিভাবে এই জলন্ত সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। পরিবেশ রক্ষা, পরিবেশ দূষণ সব কিছু নিয়ে সচেতনতা প্রসারের দায় আজ বাংলা সাহিত্যের কাঁধে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে যখন সর্বত্র চলছে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই, তখন সেই নির্মল পরিবেশ বনাম দূষণের লড়াইতে লেখনীকে অস্ত্র বানিয়ে সামিল হয়েছেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যিক কিন্নর রায়। তাঁর ‘প্রকৃতিপাঠ’,

‘বিষকুম্ভ’, ‘মৃত্যুকুম্ভ’, ‘ধূলিচন্দন’ ইত্যাদি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কবলে পড়ার কথা। ঔপন্যাসিক নিজে এক জায়গায় বলেছেন –

“ঠিক কবে যে প্রথম ভালোবেসে ফেলেছি প্রকৃতিকে অথবা ভালোবাসতে শিখেছি, তাঁর ঠিক সাল তারিখ এখন আর স্পষ্ট করে মনে পড়ে না... প্রায় অন্ধকার থাকতেই শয়্যা ত্যাগ করতেন মা। তিনিই আমায় দেখিয়ে ছিলেন কেমন করে শেষ রাতের পুষ্প কলিটি আকাশে যে অন্ধকার তা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সূর্যমুখী নবীন ভোর আসতে থাকে, তাঁর আশ্চর্য মায়ায় ফুল হয়ে ওঠে। আমার মা ‘জীবনবিজ্ঞান’, ‘প্রকৃতিবিজ্ঞান’ পড়েননি। তবে তিনি আরও অনেকের মতোই পাঠ নিয়েছিলেন জীবনের পাঠশালা থেকে।”^২

কিন্নর রায় তাঁর মায়ের কাছ থেকেই যে প্রকৃতির পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তাকে নিজ অন্তরে সাদীকরণ করে সারাজীবন করেছিলেন প্রকৃতি বন্দনা। তাঁর ‘প্রকৃতি পাঠ’ হল সেই প্রকৃতিকে ভালোবাসার পাঠক্রম।

কিন্নর রায়ের ‘প্রকৃতি পাঠ’ (১৯৯০) এর অন্যতম চরিত্র প্রকৃতি। Eco criticism - এর পদ্ধতি অবলম্বন করে পরিবেশ ও প্রকৃতিকে উপন্যাসের অন্যান্য সজীব চরিত্রগুলির সঙ্গে অতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে নিয়েছেন। উপন্যাস গুরুত্ব সূত্র নিজেই ধরিয়ে দিয়েছেন এইভাবে।

“নিজের চারপাশে আকাশ-নদী- সমুদ্রে মানুষ মিশিয়ে দিচ্ছে সভ্যতার বিষ। তেল-কালি, ধোঁয়া আর নানান দূষণে বুকের বাতাসে পড়েছে টান। পৃথিবী জুড়ে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা গ্রিণ হাউজ এফেক্টের দুঃস্বপ্ন দেখছেন। এডস, ক্যান্সার, স্টার ওয়ার বা পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এই সমস্যাটি। ক্রমাগত অরণ্য ধ্বংস করে, বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি খুন করে মানুষ তাঁর নিজের মৃত্যু পরোয়ানা রচনা করে চলেছে। এর ধ্বংসের খেলার মূল সুর বেজেছে উপন্যাসে।”^৩

বিপন্ন প্রকৃতির সবকটি স্তর লেখক তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে।

উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা। কলকাতার কিছু প্রান্তিক অঞ্চলে তখন মাটি কেটে নর্দমা বানানোর কাজ চলছে। শালের তজা পোঁতা, বর্ষার কাদায় দুর্গম পিচ্ছিল, হাঁটার অনুপযুক্ত এলাকা। সিরিটির মোড়ে নেমে যথাক্রমে বঙ্গলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, আনন্দময়ী হিন্দু হোটেল, দাসী স্টোর্স, সিরিটি শুকতারা সংঘ পেরিয়ে পুকুর পাড় ধরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে পৌঁছানো যায় উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু সুধাপ্রসন্ন, সতীপ্রসন্ন, দীপেশের একতলা বাড়িতে। কলকাতার আশেপাশে যে গ্রামাঞ্চলগুলি ছিল সেগুলো ধীরে ধীরে শহুরে জীবনচর্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শহরতলীতে পরিণত হচ্ছে। সেখানে ধানী জমি, ক্ষেত, মাঠঘাট বন জঙ্গল কমে ফ্ল্যাট বাড়ি, বড় বড় বাঁধানো নর্দমা, রাস্তা, রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা স্টেশনারী দোকান, তেলভাজা, ফাস্টফুডের দোকান সব মিলিয়ে শহুরে ব্যস্ততার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গজিয়ে ওঠা এই খুচরো ব্যবসা যেন মানুষের জীবন ধারণ পদ্ধতির পরিবর্তনশীলতাকে প্রতীকায়িত করে।

পরিবেশের বিপন্নতা থেকেই জন্ম নিয়েছে পরিবেশবাদ। মানুষ তাঁর সভ্যতাকে বিকশিত করতে, জীবন যাপনে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে, অর্থনৈতিক ভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে প্রাকৃতিক সম্পদকে নির্বিচারে ব্যবহার করেছে। ফলে বেড়েছে পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ দূষণ থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলীকে কোনো কোনো মহল থেকে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আধুনিক কৃৎকৌশলের কুফল বলে মনে করে।

“শিল্পজাত বর্জ্য যেমন চিমনির ধোঁয়া, কঠিন ও তরল বর্জ্য বস্তু, জ্বালানি থেকে নির্গত অত্যাধিক কার্বন ডাই অক্সাইড বিষিয়ে তুলেছে জল, মাটি, বাতাস সমগ্র ভৌত পরিবেশকে। ক্ষয় হচ্ছে ওজোন স্তর, গ্রিণ হাউজ অভিক্রিয়ায় তাপ বাড়ছে পৃথিবীর।”^৪

পরিবেশ সচেতনতা থেকেই পরিবেশবাদ এই চিন্তার জন্ম হয়েছে। বিশ শতকের শেষ দিক থেকেই বিভিন্ন গ্রন্থের সূত্র ধরে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিত্তিতে জন্ম নিল ‘Environmental literature’ এবং ‘Eco criticism’ তত্ত্ব। পশ্চিমী সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় গত শতাব্দীর সাত ও আটের দশক থেকে ওদেশে গবেষকেরা চেষ্টা

করছিলেন এ ধরনের ইকোটেক্সটগুলোকে সাহিত্যের ভিন্ন মানদণ্ডে ব্যবহার করতে। সমালোচনার এই তত্ত্বকে তারা Eco criticism নামে চিহ্নিত করেছেন।

পরিবেশ দূষণ যে আমাদের অস্তিত্বের পক্ষে একটি ভয়ংকর রাক্ষস বিশেষ - এই আধুনিক চিন্তা বাংলা সাহিত্যে যিনি স্পষ্ট ভাষায় ভাষায় উচ্চারণ করেছিলেন প্রথম তিনি সাহিত্যিক কিন্নর রায়। ‘প্রকৃতি পাঠ’ উপন্যাসে অন্যান্য সজীব চরিত্রগুলির সঙ্গে প্রকৃতিকে অতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে নিয়েছেন। অধ্যাপক সনৎ নন্দরও এই উপন্যাসটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইকোটেক্সট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

প্রকৃতির অকুপণ দানের পাশাপাশি কিন্নর রায় তাঁর এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণের তাণ্ডবে কিভাবে নষ্ট হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য। কলকাতার দূষণ সমস্যা আতঙ্কিত করে সতীপ্রসন্নকে। একা ‘পরিবেশ’ পত্রিকাকে অবলম্বন করে সম্পাদক সতীপ্রসন্ন লড়ে চলেছেন পরিবেশ দূষণ, পুঁজিবাদী অর্থলোলুপ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। ‘পরিবেশ’ পত্রিকার কোনো নিজস্ব লেখক গোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারেননি তিনি। পঞ্চাশ টাকার বেশি ভাউচার দিতে পারেন না লেখকদের। পুজো সংখ্যায় রোট একটু বাড়লেও প্রেসের টাকা বাকি থেকে যায়। তাঁর একমাত্র ভরসা স্থল অরিণও মোটা বেতন, নাম, প্রচারের লোভে ‘ভবিষ্যৎ’ পত্রিকায় যুক্ত হয়ে যায় সতীপ্রসন্নকে না জানিয়ে। সতীপ্রসন্ন আঁচ করতে পারেন যে, শুধু সদিক্ষা দিয়ে ‘ভবিষ্যৎ’-এর মতো নামী প্রকাশনী ব্যবসায়ী সংস্থার সঙ্গে পেরে উঠবেন না তিনি।

সতীপ্রসন্নের জীবনের একমাত্র অধ্যাবসায় তাঁর সন্তানতুল্য ‘পরিবেশ’ পত্রিকাটি। এই পত্রিকাটিকে অস্ত্র করে একা লড়াই করে চলেছেন সতীপ্রসন্ন। তাঁর ‘পরিবেশ’ পলিউশনের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ধারাবাহিক সেন্টার স্প্রেড ক্যাম্পেন করেছে। পরিষ্কার পাহাড়, সবুজের গায়ে পিকনিকের জঞ্জাল, জ্যামের টিন, প্লাস্টিকের প্যাকেট কিংবা আকাশের ছায়া বুকে নিয়ে তরঙ্গে ভেঙে পড়া নীল সমুদ্রের পাড়ে নানান এলোমেলো ফেলে যাওয়া জিনিস, পলিব্যাগ - এইভাবে প্রকৃতির কোলে স্নিগ্ধ হতে গিয়ে মানুষ সেই প্রকৃতিকে নষ্ট করে চলেছে। সব কিছুই উঠে আসছে ‘পরিবেশ’র পাতায়। পরিবেশ দূষণ নিয়ে দুর্শ্চিন্তা সতীপ্রসন্নকে অবিরত অমানিশার ঘোর জালে আবৃত করে ফেলেছে। তাঁর মনে হয় -

“মানুষ তারই সভ্যতার ধোঁয়ায়, তেলকালিতে, সমুদ্র-আকাশ-নদী সবেতেই ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষ। মাইলের পর মাইল অরণ্য ধ্বংস করে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স নষ্ট করেছে। গোটা ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়েছে গ্রিণ হাউজ ভীতি যা কিনা দুই মডার্ন কিলার এডস আর ক্যানসারের থেকেও বেশি আতঙ্ক ছড়িয়েছে মানুষের মনে।”^৫

মানুষ নিজের সমৃদ্ধির জন্য প্রকৃতিকে দোহন করেছে এবং আগের শতাব্দীতেই রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ বান্ধব সচেতন মন আশঙ্কিত হয়েছে -

“...বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রাণকে, চারিদিকে তারই আয়োজন করে রেখেছিলেন, মানুষই নিজের লোভের দ্বারা মারণের উপকরণ জুগিয়েছে। বিধাতার অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করেই মানুষের সমাজে আজ এত অভিসম্পাত। লুপ্ত মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করেই নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে, বায়ুকে নির্মল করার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।”^৬

বিশ্বব্যাপী বৃহৎ ও বিভিন্ন শিল্প সংস্থা তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বাজার সম্প্রসারণে সদা ব্যস্ত। তার মধ্যে অনেক পণ্য নেহাত বিলাসিতার অঙ্গ মাত্র। অথচ সেই পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে পরিবেশের উপর গ্রিণ হাউজ গ্যাসের বোঝা বাড়ছে।

পোকা কমছে, ব্যাঙ কমছে কলকাতার আকাশে, কলকাতার বুকে। সেই জায়গায় বহুতল বাড়িতে কীটনাশকে আর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হচ্ছে শহরের বুক। আলিপুরের চিড়িয়াখানার বিলে আর হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সাইবেরিয়া থেকে আগত হাঁসদের দল নামে না, তারা এখন নামছে সাঁতরাগাছির বিলে। তাদের স্বাভাবিক গতিবিধির সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আলিপুরের চিড়িয়াখানার পার্শ্বস্থ আকাশচুম্বী পাঁচতারা হোটেল, শব্দদূষণ ও চোরা শিকারীর অত্যাচার। মাইগ্রেটেড পাখির সংখ্যা দিনে দিনে কমছে। ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স যে দিনে দিনে হ্রাস প্রাপ্ত এটাই তার প্রমাণ। সতীপ্রসন্ন এই সকল তথ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তাঁর ‘পরিবেশ’ পত্রিকায়। অবিরাম চেষ্টা করে যান শহুরে মানুষকে, সরকারকে সচেতন

করে তোলার। দাদা সুধাপ্রসন্নের হাতিয়ার খবরের কাগজের সম্পাদকীয় পাতা ও সতীপ্রসন্নের হাতিয়ার তাঁর ‘পরিবেশ’ পত্রিকা। এই দুই গণমাধ্যম দ্বারা ক্রমাগত লড়াই জারি রাখেন বিপথগামী পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে। অরিণের অর্থের লোভে ‘পরিবেশ’ পত্রিকা ত্যাগ করার ঘটনায় সতীপ্রসন্ন কিছুটা দমে গিয়েছিলেন। অরিণকে সঙ্গে নিয়ে যে উদ্যমে এগোচ্ছিলেন, সেই উদ্যম কিছুটা যেন হারিয়ে ফেলছিলেন, কিন্তু উপন্যাসের শেষে যখন সমর এসে সতীপ্রসন্নকে মাঠপুকুর বুজিয়ে ফ্ল্যাট বাড়ি তোলার বিপক্ষে ক্যাম্পেন এর প্রধান মুখ হিসেবে সামিল করে, তাঁর পিছনে সমর, আসলাম, সফি, ফিরিজি কেইট জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পরিবেশ রক্ষার লড়াইতে সামিল হয়, তখন সতীপ্রসন্ন আবার নতুন উদ্যমে মাঠপুকুর বোজানোর লড়াইতে যোগ দেয়। সকালবেলা মাঠপুকুরের চারিদিকে থাকা গরিব মুসলমানদের ছোট ছোট বাড়িগুলির দেওয়ালে মাঠপুকুর বাঁচানোর প্ল্যাকার্ডগুলি চোখে পড়ে তাঁর। লেখাগুলো আগের রাতে বৃষ্টিতে ধেবড়ে গেছে কিন্তু তাও যেন উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই উজ্জ্বল লেখাগুলি যেন ফিকে হওয়ার নয়। সুন্দরলাল বহুগুণা, মেধা পাটেকর, চণ্ডীপ্রসাদ ভাটের মতো অক্লান্ত যোদ্ধারা একাকী যে লড়াই শুরু করেছিলেন, পরে তারা সেই আন্দোলনে আরও অনেককে পাশে পেয়েছেন, পরে সেই আন্দোলনগুলি জনপ্রিয়ও হয়েছে।

কিন্নর রায় এই উপন্যাসকে বিভিন্ন ডায়মেনশনে পরিবেশন করেছেন। একটা স্তরে কলকাতার পাখি, পাখি ব্যবসা, বাবু কালচারের অন্যতম অঙ্গ পাখি পোষা, শৌখিনতা, দূষণের কারণে পাখি কমে যাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে ‘প্রকৃতি পাঠ’ উপন্যাসে। অধ্যাপক সনৎ নস্কর ‘ইকোট্রিসিজমঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট’ প্রবন্ধে বলেছেন –

“ ‘প্রকৃতিপাঠ’ (১৯৯০) বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘ইকোটেক্সট’ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। আজকের বিশ্ব নগরায়ণের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বন বাদাড় কেটে কংক্রিটের জঙ্গল বসছে প্রোমোটরদের হাত ধরে। আধুনিক প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে স্বচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে দিলেও বিষাক্ত করে তুলছে আকাশ বাতাস। জনসংখ্যার চাপে যে কোনও শহর আজ হাঁসফাঁস করছে। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গাড়ি ঘোড়া, কলকারখানা, নোংরা বস্তি ও অপরিচ্ছন্ন বাজার, রাস্তার ধুলো, নোংরা তেলকালি, কারখানার ধোঁয়া আর অজস্র গাড়ীর শব্দদূষণ আমাদের সুস্থ নাগরিক জীবনকে প্রতিমূহুর্তে বিপন্ন করছে। এতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের সামগ্রিক ভারসাম্য। কিন্নর তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন আড়ে দীঘে বাড়তে থাকা আমাদের তিলোত্তমা শহর কলকাতাকে। সিরিটি, মহাবীরতলা, করুণাময়ী, জোকা, ঠাকুরপুকুর, সরশুনা, হরিদেবপুর দক্ষিণ কলকাতার একটি বিশেষ অঞ্চলকে লেখক তাঁর উপন্যাসের ক্যানভাসে পরিণত করেছেন।”^৭

লেখক দেখিয়েছেন কৃত্রিম সৌন্দর্যায়নের ফলে কলকাতার বুক থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ। পাতাল রেল, চক্ররেল, দ্বিতীয় হুগলি সেতু, ময়দান, পার্শ্ববর্তী পার্কের বেশ খানিকটা সবুজ জমি খেয়ে নিয়েছে –

“বহুতল বাড়ি নামিয়ে দিচ্ছে জলের স্তর। বে-আইনি কনস্ট্রাকসন ভেঙে পড়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। শাল গাছ কেটে, অরণ্য ধ্বংস করে মানুষ তাঁর সুবিধের জন্য লাগাচ্ছে ইউক্যালিপটাস। যা জলের স্তর নামিয়ে দিচ্ছে বনভূমির।”^৮

কিন্নর রায় তাঁর এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণের তাগুবে কিভাবে নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। সংশ্লিষ্ট অংশে লেখক লিখেছেন –

“কলকাতা আর তাঁর আশেপাশের দু’হাজার ফার্নেসের চিমনির মুখ দিয়ে তিনশো ছিয়ানকবই টন বিষাক্ত ধোঁয়া মিশে বাতাসে। তাঁর সঙ্গে আছে ষাট হাজার রান্নার উনোনের ধোঁয়া। প্রতি বর্গমাইল বাতাসে প্রতিদিন দুশো একাত্তর মেট্রিকটন দূষিত পদার্থ মিশেছে।”^৯

কিন্নর রায় তাঁর অপর আরেকটি উপন্যাস ‘ধূলিচন্দন’-এ এই একই সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। চোরাশিকারীর দাপটে পরিযায়ী পাখি হ্রাস পাওয়ার সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। এই কাহিনিতে দেখা যায় রাজশেখর সান্যাল বলে একজন, পূর্ববঙ্গের জমিদার পরিবারের মানুষ বর্ডারে তাঁর পোষা হাতিকে রেখে এদেশে চলে এসেছিলেন। কারণ সে হাতিকে পাকিস্তানি পুলিশ সঙ্গে করে নিয়ে আসতে দেয়নি। এরপর পূর্ব পাকিস্তানে না খেয়ে পেয়ে হাতিটি মারা যায়। হাতিদের

বাসস্থানের অভাব, খাদ্যের অভাব সত্য বিভিন্ন বিষয় ফুটে উঠেছে। হাতিরা বনভূমি ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসছে, ক্ষেতে এসে ফসল খাচ্ছে, নষ্ট করছে এবং মানুষের আক্রমণের শিকার হচ্ছে, আহতও হচ্ছে। এইসব ঘটনা ‘ধূলিচন্দন’ উপন্যাসে পেয়েছি। দলমার হাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে চলে আসছে, তাঁর কারণে তারা তাদের পর্যাপ্ত খাদ্য জঙ্গলে পাচ্ছে না। এর পেছনে মানুষ দায়ী। জঙ্গলের মধ্যে রিস্ট, সাফারির গাড়ি, ছবি শিকারীও পর্যটকের অত্যাধিক ভীড়, জঙ্গলের গাছপালা কেটে ফেলা হাতি করিডরগুলিতে যথেষ্ট ভাবে গাড়ীর চলাচল ইত্যাদি কারণে হাতির বা অন্যান্য বন্য পশু তাদের সুরক্ষিত জায়গায় নিরাপদে নির্জনে থাকতে পারছে না। এর জন্য বন্য পশুদের বংশবৃদ্ধি জীবন যাপনের গতি প্রকৃতি পাটে যাচ্ছে। শুধুমাত্র রেলের কাটা পড়ে প্রত্যেক বছর কত হাতির মৃত্যু হয়। সরকার বনভূমির মধ্য দিয়ে রেল পথ নির্মাণ করছে। হাতির পাল রাস্তা পার হতে গিয়ে রেল লাইনে কাটা পড়ছে। শুধু হাতি নয় বাঘ, গণ্ডার, হরিণ, বনশূকর ইত্যাদি জীবজন্তু লোকালয়ে চলে এসে মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে। লেখক ‘ধূলিচন্দন’ উপন্যাসে দেখিয়েছিলেন –

“এক বন থেকে অন্য বনে, এক রাজ্য থেকে ভিন্ন রাজ্যে হাতি যাওয়া মানেই তো হল পাটি, মশাল, হইচই, টায়ার জ্বালান আগুন তাদের দিকে ছোড়া- সবই নাকি জংলি হাতি তাড়াতে, এভাবেই ওদের ফেরানোর চেষ্টা পুরোনো ঠিকানায়। কিন্তু হাতিরা শুনলে তো! মাঠে, মাঠে নতুন ধান পেকে উঠেছে, হাওয়ায় হাওয়ায় তাঁর সুগন্ধ এদিক ওদিক সব দিক। তাছাড়া তাড়ীর দোকানে খেজুর তাড়ির সফেন আহ্লাদ। ফলে সোনালি ধান বোঝাই মাঠে নেমে পড়া। যত ইচ্ছে খাও পেট পূরে। বাকিটা খেতে না চাইলে মানে পেটে না ঢুকলে নষ্ট কর। তাড়ির দোকানের বেলাতেও তাই। সুযোগ পেলে ঢুকে তাড়ি খাও চোঁ চোঁ। তারপরে মাতাল হয়ে ইচ্ছে খুশি কাজ কর।”^{১০}

‘মৃত্যুকুসুম’ উপন্যাসে পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন, জঙ্গল কাটা, পশুপাখি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, জলাভূমি নষ্ট করে আকাশচুম্বী অট্টালিকা বানানো, পুকুর বুজিয়ে ফ্ল্যাট নির্মাণ, নদীতে বাঁধ দিয়ে তাঁর স্বাভাবিক গতি রোধ করা ইত্যাদি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে চলেছে। যতটুকু বনভূমি ছিল তা আজ উড়ালপুল, রাস্তা, হাইওয়ে নির্মানের ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

“মানুষ তাঁর সীমাহীন চাহিদায় নির্বিচারে গাছ কেটে জঙ্গল ধ্বংস করে বিভিন্ন পশুপাখিকে বিলুপ্ত করছে, জলাভূমি নষ্ট করে গড়ে তুলছে আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা, পুকুর বুজিয়েছে, নদীগুলিকে বড় বড় বাঁধ বেঁধে এতোদিনকার পরিবেশের ভারসাম্যের বারোটা বাজিয়েছে।”^{১১}

পরিযায়ী পাখি পশ্চিমবঙ্গের বিলে আসা কমে যাওয়ার প্রসঙ্গও এই উপন্যাসে আছে। এর পাখিগুলি হিমালয়ের পাদদেশে বা সাইবেরিয়া থেকে শীতের মরসুমে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে চলে আসে। কিন্তু এই অঞ্চলের শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ ইত্যাদির কারণে পাখির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এর সমস্যার কথা ‘প্রকৃতি পাঠ’ উপন্যাসেও আছে।

“পাঁচতারা হোটেল, শব্দদূষণ, ঘুড়িতে বঁড়িশি বাধা, চোরশিকারি, ফিরিয়ে দিচ্ছে নাকাতা, ছোট সরাল, বড় সরাল, নীল ডানা আর সূচি পুচ্ছ হাঁসদের।”^{১২}

এখন বড় জোর সাত আট হাজার পরিযায়ী পাখি আসে চিড়িয়াখানার জলে। দশ বছর আগেও আসত বারো তেরো হাজার মাইগ্রেটেড পাখি। আর ‘মৃত্যুকুসুম’ উপন্যাসেও সেই একই প্রসং উঠে এসেছে।

“শীতে এদিকটায় অনেক বালিহাঁস উড়ে আসত। প্রায় ফুরিয়ে আসা বর্ষার বিকেলে এসব কথা বাতাসে ভাসলে সময় হয়ত বা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে চায় তাঁর দিকে।”^{১৩}

‘মৃত্যুকুসুম’ উপন্যাসে আছে গাছ কেটে রাস্তা বড় করার প্রসংগ –

“সকালে এদিকটায় রাস্তা চওড়া করতে হবে বলে একটা বড় নিম গাছ কেটেছে পি ডব্লিউডির লোকজন।...একটা ভিজে ভিজে মোহময় গন্ধ আছে নিম কাঠের। ...তাতে চিবিয়ে চিবিয়ে কচি বাবলা বা নিম ডালে দাঁত মাজার একটা আলাদা মজা ছিল। এখনও আছে। ...নিম গাছের কাটাগুঁড়ি আর ডালের গন্ধে কেমন একটা মায়াবী বিষাদ জড়িয়ে আছে। সে এক আকুল করা মন খারাপ, এটা কেন হয় কে জানে!”^{১৪}

এভাবেই রাস্তা তৈরি করার জন্য গাছ কাটা হয়। মানুষের ক্রমাগত বিলাস বাহুল্যের ঠেলায় পরিবেশের স্বাস্থ্য হচ্ছে বিঘ্নিত। আধুনিকতার জোয়ারে কত শত জলাভূমি, বনভূমি, কীটপতঙ্গ এবং আমাদের চারপাশের চেনা পরিবেশ হারিয়ে যাচ্ছে। ‘হনন ঋতু’ নামক আখ্যানেও লেখক গাছদের কষ্ট, গাছদের যন্ত্রণা ও হাহাকারের কথা বলে গেছেন। বিগত শতাব্দীতেই রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ বান্ধব সচেতন মন গাছপালা কেটে ফেলা নিয়ে আশঙ্কিত হয়েছিল।

“মানুষ অমিতাচারী, যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তাঁর আদান প্রদান, ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ব বোধ হারাল, যে তাঁর প্রথম সুহৃদ, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইঁট কাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য।”^{১৫}

বর্তমান সময়ে নদী হারিয়ে ফেলেছে তাঁর স্বাভাবিক নাব্যতা। আমাদের উন্নত পৃথিবীর বর্তমান সমাজের একটি অন্যতম উপাদান হল প্লাস্টিক। প্লাস্টিকের যথেষ্ট ব্যবহার, যত্রতত্র প্লাস্টিক ফেলা, সেই সকল প্লাস্টিক অন্যান্য বর্জ্যের সঙ্গে মিশে নদীগর্ভে নদীর ধারে ধারে গড়ে ওঠা বড় বড় মাল্টিস্টোরিড, রিভার ভিউ আবাসনের জন্য নদীতে ড্রেজিং করাও প্রায় অসম্ভব। সুতরাং এক সময় যে নদীতে বড় বড় ট্রলার, লঞ্চ, স্টিমার চলতো, সেগুলি খালে পরিণত হয়েছে। কচুরিপানায় ঢেকে গিয়েছে। ‘ধূলিচন্দন’ উপন্যাসে জলঙ্গি নদীর করুণ অবস্থার কথা লিখেছেন ঔপন্যাসিক –

“জলঙ্গির জল এখানে অনেক কম। গরমে এমনিতেই নদী শুকিয়ে আসে।”^{১৬}

কিছুদিন আগে ‘এই সময়’ সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয়তে অনিতা অগ্নিহোত্রী কেলেয়াই নদীর নদীখাত শুকিয়ে যাওয়া নিয়ে লিখেছিলেন। সেখানেও নদীর শুষ্কতা নিয়ে আশঙ্কা স্পষ্ট –

“নদী ব্রিজের উপর রৌদ্রের খরতাপ। চোখে পড়ছে। মলিন নদীখাত, তাঁর শুষ্কতা। জলহীন নদীর ধারে পাম্প বসিয়ে তুলে নেওয়া হচ্ছে জল।”^{১৭} (‘এই সময়’, ৩১ মার্চ, ২০২৪)

নদীর ধারে যে জমিতে চাষ হত, সেখানে চাষীদের বাধ্য করা হচ্ছে বিলের জন্য লিজ নিতে। সেখানে চিংড়ির ভেড়ি হচ্ছে। এই কথা কিল্লর রায়ও বলেছেন –

“বিশ্বায়নের বিষ নানা দিক থেকে চুইয়ে নামছে আমাদের জীবনে। আমার আকাশ, আমার বাতাস, আমার অরণ্য, সমুদ্র নদী সমস্ত বিপর্যস্ত। নদীর বুকে অবাধে গড়ে উঠছে ইটভাটা, ভেড়ি। চিংড়ি আর বাগদার মীনকে চাষ করে বাড়ানোর নামে ভেঙে ফেলা হচ্ছে প্রাকৃতিক চক্র।”^{১৮}

‘বিষকুম্ভ’ উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি পূর্ববঙ্গের স্বচ্ছ অনাবিল প্রকৃতির ছবি। পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি জলজ জীব, মাছ চাষ, নদীপথে আমদানি রপ্তানিতে অভ্যস্ত। উপন্যাসে দীপঙ্কর রায়ের মা বলেছেন ফরিদপুরে মাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। মাছের জন্য চাই জলের গভীরতা। বর্তমানে ছোটো ছোটো নদীগুলি নাব্যতা হারিয়েছে। জলের মধ্যে কলকারখানার বর্জ্য এসে মিশেছে। সেই রাসায়নিক মাছের পেটে গিয়ে বিষক্রিয়া হচ্ছে। এতেও মাছ কমছে। এই উপন্যাসে তিনি যেমন নদীর গভীরতা কমে যাওয়ার কথা বলেছেন, তেমনই আর্সেনিক দূষণের কথাও বলেছেন। প্রতিনিয়ত অতিরিক্ত পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল তোলা হচ্ছে পাম্প দিয়ে। এই জল অনেক সময় যথোপযুক্ত কাজে যেমন ব্যবহার হচ্ছে না তেমনি পানীয় জলের অপচয় ও হচ্ছে অনেক বেশি। এই যে ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহার হচ্ছে তাঁর ফলেই আয়রন ও আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জয়া মিত্র যিনি জল নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করে চলেছেন তিনিও এই বিষয় নিয়ে আশঙ্কিত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি করছেন –

“আজ দেশের পানীয় জলের বেশির ভাগটাই উত্তোলিত হয় ভূগর্ভ থেকে। এই তীব্র সংকট বিষয়ক সতর্কবার্তা আজ কয়েক বছর ধরে সারা পৃথিবীতেই বারে বারে দিয়ে যাচ্ছেন আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন সংগঠন। ভূগর্ভের জলের প্রধান দুটি সমস্যা নিয়ে অন্যান্য বছরের মতোই সরকারের উদাসীনতা নিয়ে আক্ষেপ করছে সাউথ এশিয়া নেটওয়ার্ক অন ড্যামস, রিভারস অ্যান্ড পিপল। একদিকে ভূগর্ভে জল পৌঁছান ও উত্তোলনের অসামঞ্জস্য, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ জলস্রোতগুলির উদ্বেগজনক দূষণ। ...তাঁর

ফলে প্রাকৃতিক জীব বৈচিত্র্য ও তীব্র সংকটের মধ্যে পড়েছে।”^{১৯} (১৭ মার্চ, ২০২৪ এই সময় সংবাদ পত্র, সম্পাদকীয়)

‘ব্রহ্মকমল’ উপন্যাসেও লেখক নদীদের দীর্ঘশ্বাস ও নদীদের মরে যাওয়ার আতঁরব তুলে ধরেছেন। যে নদীর বুক দিয়ে একসময় কত দাঁড় টানা নৌকা চলে যেত, পাল তোলা নৌকা নিয়ে বনিকেরা যেত বাণিজ্য করতে, সেই নদী আজ মরে যাচ্ছে। তাঁর বুক গভীরতার চিহ্ন মাত্র নেই।

“নদীর স্রোত বুজে গেলে বালিভূমি, মরে যাওয়া নদীর শুকনো খাদ, বুকের মধ্যে জমে যাওয়া বেহায়া বালি সব মিলিয়েই তো তৈরি হতে থাকে স্বপ্ন। কখনো কখনো গভীর জল ছলছলাৎ ছলছলাৎ ঢেউ ঢেকে দেয় গ্রাস করে মানুষের ঘরবাড়ি জনপদ।”^{২০}

মানবীয় অস্তিত্বের বিপন্নতাকে প্রথম উপন্যাসের শিল্পরূপে বাংলায় প্রথম তুলে ধরেছেন কিম্বর রায়। প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষণ নিয়ে চিন্তাভাবনা যখন বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে তখন সেই চিন্তা কিম্বর রায়ের মননশীল চিন্তনে গভীরভাবে সাড়া জাগিয়েছেন। পরিবেশ দূষণের ভয়ঙ্কর রূপ লেখকের হৃদয়কে ভাবান্তিত করেছিল। সেই ভাবনারই বিকাশ ‘প্রকৃতি পাঠ’ উপন্যাসের হাত ধরে। যে উপন্যাস সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখেছিলেন— ‘কিম্বর রায়ের প্রকৃতি পাঠ অন্য ধরনের উপন্যাস। পরিবেশ দূষণকে নিয়ে কেউ এর আগে উপন্যাস লিখেছেন কিনা জানি না। অরণ্য পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ — সে অনেকদিন হয়ে গেল। তিনি যখন সে কাহিনি লিখেছিলেন তখন সে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে শুধু সৌন্দর্য ও শান্তির দিকে তাকিয়ে। মানবীয় অস্তিত্বের বিপন্নতার দিকে লক্ষ রেখে বিষয়টির উপন্যাসগত উত্থাপন প্রথম পাওয়া গেল ‘প্রকৃতিপাঠ’ উপন্যাসে। শুধু ‘প্রকৃতিপাঠ’ নয় – ‘মেঘপাতাল’, ‘ধূলিচন্দন’, ‘মৃত্যুকুসুম’ – একের পর এক উপন্যাসকে হাতিয়ার করে বিশ্বায়নের প্রভাবে রিক্ত হয়ে যাওয়া পৃথিবীর ছবি তুলে ধরেছেন। পরিবেশ ভাবনায় সম্পৃক্ত এই উপন্যাসগুলি একেকটি যথার্থ ইকো টেক্সট হয়ে উঠেছে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সাহিত্যের বিচারক’, সাহিত্য প্রবন্ধ গ্রন্থ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কার্তিক, ১৪১১, পৃ. ২৭
২. রায়, কিম্বর, ‘আমার প্রকৃতি পাঠ’, সাহিত্য বিচারে পরিবেশ কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, সম্পাদনা—দোলা দেবনাথ, মিত্রম, জানুয়ারী—২০১৩, পৃ. ৬৯
৩. রায়, কিম্বর, ‘প্রকৃতিপাঠ’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০, পৃ. ভূমিকাংশ
৪. মুখোপাধ্যায়, দেবলীনা, ‘পরিবেশ ভাবনা ও প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ’ গাংচিল কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১৮
৫. রায়, কিম্বর, ‘প্রকৃতি পাঠ’, ঐ, পৃ. ২১
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘অরণ্যদেবতা’, ‘পল্লীপ্রকৃতি’, বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৪১৭, পৃ. ৮৭
৭. নস্কর, সনৎ, ‘ইকোট্রিসিজমঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট’, ‘সাহিত্য বিচারে পরিবেশ কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, সম্পাদক—দোলা দেবনাথ, মিত্রম, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১৩, পৃ. ৩৫
৮. রায়, কিম্বর, ‘প্রকৃতি পাঠ’, পৃ. ৩৭
৯. রায়, কিম্বর, ‘প্রকৃতি পাঠ’, পৃ. ৭৩
১০. রায়, কিম্বর, ‘ধূলিচন্দন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী – ২০০৫, পৃ. ১৪৮
১১. রায়, কিম্বর, মৃত্যুকুসুম, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০৭, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল—২০১৬, পৃ. ৩৫৩
১২. রায়, কিম্বর, ‘প্রকৃতি পাঠ’, পৃ. ৩৭

১৩. রায়, কিম্বর, মৃত্যুকুসুম, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারী-২০০৭, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল-২০১৬, পৃ. ১১
১৪. রায়, কিম্বর, মৃত্যুকুসুম, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারী-২০০৭, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল-২০১৬, পৃ. ১৯
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'অরণ্যদেবতা', বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৪১৭ পৃ. ৮৬
১৬. রায়, কিম্বর, 'ধূলিচন্দন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী - ২০০৫, পৃ. ১৩
১৭. অগ্নিহোত্রী, অনিতা - সম্পাদকীয়, এইসময় পত্রিকা, ৩১ মার্চ, ২০২৪
১৮. রায়, কিম্বর, মৃত্যুকুসুম, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০৭, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল-২০১৬, পৃ. ৩৫৪
১৯. মিত্র, জয়া - সম্পাদকীয়, এইসময় পত্রিকা, ১৭ মার্চ, ২০২৪
২০. নন্দী সাথী, 'কিম্বর রায়ের সাহিত্য জীবন ও সাহিত্য ভুবন', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২০, পৃ. ১৯